হাতে হাতে জ্বলুক মশাল

আজ ইস্টবেঙ্গলের প্রতিষ্ঠা দিবস। বহু উত্থান-পতন পেরিয়ে এই ক্লাব ১০৫ বছরে পা দিল। শতাব্দী প্রাচীন ইস্টবেঙ্গলের ইতিহাসে থেকে গিয়েছে বহু গৌরবজনক অধ্যায়। তার নানা দিক তুলে ধরল খেলার সময়

জংলার অভিমান, সুভাষের সেই আয়-আয় ডাক

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

না, না, জংলাকে ১১ জনে রাখতে হবে না। ১৬ জনে থাকতে পারে।' টিম মিটিংয়ে তখন পিন পড়ার স্তব্ধতা। পরের দিন আইএফএ শিল্ড ফাইনাল। সামনে ইরানের দুর্ধর্ষ পাস ক্লাব। সেই সময়ে ইরানের প্রায় পুরো জাতীয় টিমটাই যেন খেলতে এসেছিল পাস ক্লাবের হয়ে। আর সেই টিমের বিরুদ্ধে খেলার আগেই প্রায় বাদ দেওয়া হচ্ছিল পরিমল দে-কে! যে পরিমল দে লাল হলুদ জনতার কল্পনার জগতে মোহনবাগানের কিংবদন্তি চুনী গোস্বামীর বিকল্প হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখাতেন। ১১ নয়, ১৬ জনের টিমে রাখা হোক জংলাকে (পরিমল দে-কে ময়দান এই নামেই ডাকত), এমন পরামর্শ ছিল স্বয়ং ইস্টবেঙ্গল সচিব ডাক্তার নৃপেন দাসের। সচিবের কথা উপেক্ষা করাও যাবে না। আবার পরিমলকে বাদ দিয়ে টিম নামানো! তা-ও যে অসম্ভব! মহা বিপদে পড়ে গিয়েছিলেন অধিনায়ক শান্ত মিত্র। ইরানের ফুটবলকে ধ্বংস করতে হলে তাঁর যে জংলাকে চাই-ই চাই। এ দিকে, প্রথম এগারোয় রাখা হবে না শুনে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত পরিমল 'খেলবই না' বলে সে দিন বেরিয়ে গিয়েছিলেন ড্রেসিংরুম থেকে। শান্ত মিত্র রাত পর্যন্ত বুঝিয়েছিলেন বন্ধুকে। ফোনে বলেছিলেন, 'তুমি শুধু মাঠে এসো অন্তত।' সত্যিই বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি পরিমল। সে দিন পৌঁছে গিয়েছিলেন ইডেনে। এ দিকে, ক্লাব থেকে বেরনোর সময়ে শঙ্কর মালিকে দেখতে পেয়ে শান্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন, জংলার জার্সি-বুট-হোর্স নিয়ে ইডেনে চলে আসতে। লাল হলুদের অভিজ্ঞ শঙ্করবাবা তখনই বুঝে গিয়েছিলেন, হতে চলেছে কিছু একটা। ইডেনের ভরা গ্যালারির সামনে সে দিন পাস ক্লাবের বিরুদ্ধে দূর্দান্ত লড়েছিলেন মহম্মদ হাবিব ও সুধীর কর্মকার। টাকা পাননি বলে যে হাবিব আগের দিন প্র্যাক্টিসে পর্যন্ত আসেননি। তিনিই উজাড় করে দিয়েছিলেন নিজেকে। একেবারে শেষ দিকে আচমকা চোট পেয়ে যান হাবিব। আর এখানেই তৈরি হয় ইতিহাস। হাতের ইশারায় পরিমল দে-কে নামতে বলেন শান্ত মিত্র। যিনি ম্যাচের আগে সচিবকে না জানিয়েই টিম লিস্টে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন পরিমলের নাম। শান্তর ইশারা দেখেই জার্সি-বুট পরিয়ে জংলাকে তৈরি করে দিয়েছিলেন শঙ্কর বাবা। যখন নামলেন, শেষ বাঁশি বাজতে মিনিট দু'য়েক বাকি। আর বাকি তিরিশ সেকেন্ড। বলটা পেয়েছিলেন স্বপন সেনগুপ্ত। চকিতে মুখ তুলে দেখে নিয়েছিলেন, কোথায় আছেন তাঁর জংলাদা। একটা লম্বা মাইনাস। মাটিতে বল পড়ার আগেই পরিমলের শট। গোটা ইডেন মুগ্ধ হয়ে দেখেছিল, বল জড়িয়ে গিয়েছে জালে! প্রবল উচ্ছ্বাস ঢেউ হয়ে আছড়ে পড়েছিল ময়দান জুড়ে। তারপরে কত-কত ভালো ম্যাচ খেলেছেন ইস্টবেঙ্গলের পরিমল। কিন্তু আজও পরিমল দে বলতেই পাস ক্লাব এবং সেই অলৌকিক গোল! যে লোকটার খেলার কথাই ছিল না, সেই তিনিই হয়ে উঠলেন চিরকালীন 'নায়ক।' আসলে, সত্তর দশক মানেই যে ইস্টবেঙ্গলের সোনার দশক। ৭০ থেকে ৭৫, টানা পাঁচবার কলকাতা লিগ জয়। ৭৫-এ ঐতিহাসিক পাঁচ গোল। সে দিন নাকি গ্যালারি থেকে ইস্টবেঙ্গল সচিব নৃপেন দাস চিৎকার করে ফুটবলারদের বলেছিলেন, 'ওরে আর গোল দিস না। মোহনবাগানের ধীরেনকে পদত্যাগ করতে হবে। আমার বন্ধু মানুষ। ছেড়ে দে।' সেই ম্যাচে কত মিথ। সুভাষ ভৌমিক নাকি ডেকে ডেকে বাকিদের দিয়ে গোল করিয়েছিলেন। অনেক পরে এই বিষয়ে জানতে চাওয়ায় সুভাষ ভৌমিক বলেছিলেন, 'ও রকম নয়। আমি প্রচণ্ড জোরে দৌড়তাম। টিমের বাকিরা আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না। মোহনবাগান ফুটবলাররাও খুব ক্লান্ত ছিল সে দিন। আমি সতীর্থদের হাত নেড়ে আমার সঙ্গে উঠতে বলতাম। সেটারই ভুল ব্যাখ্যা হয়েছিল।' ঘুরে দাঁড়াতে ৭৬-এ পিকে বন্দ্যোপাধ্যায়কে কোচ করে আনে মোহনবাগান। আকবরের ১৭ সেকেন্ডের গোলে জয়ে ফেরে সবুজ মেরুন। পরের বছরেই দুরন্ত মোহনবাগান টিমের বিরুদ্ধে দু'গোলে আবার জেতে ইস্টবেঙ্গল। গোল করেছিলেন সমরেশ চৌধুরী এবং নবাগত মিহির বসু। সেই ম্যাচে জন্ম হয়েছিল নতুন তারা মিহিরের। আসলে, সত্তরের ইস্টবেঙ্গল নিয়ে লেখা যায় পাতার পর পাতা। সে যে ছিল এক সোনার সময়! পরিমল-সুভাষ দু'জনেই আজ বহু দূরে। তবু তাঁদের গল্প রূপকথা হয়ে ময়দানে উড়ে বেড়ায় আজও।

১৯৭৫ সালে মোহনবাগানকে পাঁচ গোল দেওয়ার ম্যাচের আগে টিম ইস্টবেঙ্গল

একটা সময় র‍্যাম্পার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতাম। কোনওদিন ভাবিনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব হতে পারব। এটা যে আমার কাছে কতটা গর্বের, বলে বোঝাতে পারব না। আরও ভালো লাগবে যদি আমি সচিব থাকার সময়ে আইএসএল ট্রফি আমাদের ঘরে ঢোকে। দেশের সব ট্রফি জিতেছি। এটাই শুধু বাকি। আর একটা কথা। আমি সচিব থাকি বা নাই থাকি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্য আমি চিরকাল থেকে যাব। চেয়ার নয়, ইস্টবেঙ্গলের একজন কর্মী হিসেবেই আমি গর্বিত। ক্লাবের ভালোর জন্য কাজ করে যাব সব সময়।
রূপক সাহা। ইস্টবেঙ্গল সচিব

মশাল
সব্যসাচী সরকার

পায়ে বল যখন থাকে,
কাউকেই করে না ভয়
শিরাতেও রক্ত ছোটে
ওরা খুব সামান্য নয়।

ইতিহাস সোনায় মোড়া
ধুকপুক হৃদয় জুড়ে
মাঠে জান কবুল করে
লাল আর হলুদ সুরে।

ওরা সব দামাল ছেলে
তেকাঠি ভালোই বোঝে
আশিয়ান-রোভার্স-ডুরান্ড
একজোট ট্রফির খোঁজে।

পাঁচ গোল পঁচাত্তরে
ভাঙেনি, রেকর্ড তাজা
আমাদের ভাতের পাতে
বর্ষায় ইলিশ ভাজা।

কোরাসে চরৈবেতি
স্বপ্নে নতুন সকাল
প্রতিটি পাড়ার মোড়ে
হাতে হাতে জ্বলুক মশাল!

বলরামের অলৌকিক গোল ভুলতে পারব না

মুরারি লাল লোহিয়া
(প্রেসিডেন্ট, ইস্টবেঙ্গল)

রামবাহাদুরের পাস মাটি ঘেঁষে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিল সে দিন। আমরা সবাই জানি, বল বাইরে চলে যাচ্ছে। আচমকা মাটিতে শুয়ে পড়ে একেবারে উল্কার মতো গতিতে বলে পা লাগালেন তুলসীদাস বলরাম। চোখের পলক ফেলার আগে দেখি, বল জড়িয়ে গেছে জালে! অবিশ্বাস্য-অলৌকিক বললেও কম বলা হয়। কিছুদিন আগে ইউরো কাপে ঠিক এ রকম একটা গোল দেখলাম। আমি তাই ভাবি, কত বছর আগে আমার ক্লাবে বলরামের পা থেকে এ রকম গোল দেখে নিয়েছি। খুব ভুল না করলে, একেবারে পঞ্চাশের দশকের শেষ থেকেই ইস্টবেঙ্গলের খেলা দেখছি আমি। কিন্তু, ওই রকম গোল আর দুটো দেখলাম না!

প্রথম যখন বাবার হাত ধরে মাঠে আসি, তখন আমার বয়স পাঁচ। অত ছোট বেলার স্মৃতি সাধারণত মনে থাকে না। কিন্তু, ইস্টবেঙ্গল মাঠে প্রথমবার আসার স্মৃতি আমার মনে থেকে যাবে চিরকাল। এ জিনিস যে ভোলা যায় না। আমি সেই মানুষ, যে ঘোড়া পুলিশের ঝামেলা এড়িয়ে খেলা দেখেছে। এমনকী, আমাদের পঞ্চপাণ্ডবের শেষদিকের খেলাও আমি মাঠে বসে দেখেছি।

১৯৭৫ সালে মোহনবাগানকে পাঁচ গোল দিয়েছিলাম আমরা। সেই ম্যাচে মাঠে ছিলাম। তখন সুভাষ চক্রবর্তী, পরে যিনি মন্ত্রী হয়েছিলেন, তিনিই আমাকে মাঠে নিয়ে গিয়েছিলেন। পাঁচ নম্বর গোলটা হওয়ার পরে ওঁকে নাচতে দেখেছিলাম!

আসলে, ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বহু-বহু ঘটনা। লিখে শেষ করা যাবে না। খেলা দেখতে-দেখতেই কখন যে ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলাম, নিজেই বুঝতে পারিনি। পল্টুদা আমাকে খুব ভালোবাসতেন। প্রণবদাও ভরসা করতেন। মনে আছে, কৃশানু-বিকাশ যখন আমাদের ক্লাবে এল, তখন আর্থিক একটা সমস্যা হয়েছিল। পল্টুদা আমাকে বলায় আমরা কয়েকজন মিলে টাকা জোগাড় করে দিয়েছিলাম।

আজ সেই ক্লাবেই প্রেসিডেন্টের সম্মান পেয়েছি। নীতু অনেকদিন ধরেই বলছিল। আর দূরে থাকতে পারিনি। প্রেসিডেন্ট হিসেবে আমার একটা লক্ষ্য আছে। সেটা হল, ইস্টবেঙ্গল বাংলার ক্লাব। বাংলার ফুটবলাররাই এই ক্লাবের প্রাণ ছিল। এখন বাংলার ফুটবলার প্রায় হাতে গোনা। আমরা চাই, ইস্টবেঙ্গল আবার বাংলাকে পথ দেখাক। আবারও বাংলা হয়ে উঠুক ভারতীয় ফুটবলের মুখ। তার শুরুটা হবে আমাদের ক্লাব থেকেই। এই স্বপ্ন দেখি আমরা। আর আমি জানি, ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্বপ্নকে বাস্তব করতে জানে। এই ক্লাবের ইতিহাস গৌরবের ইতিহাস। সারা বিশ্বে আমাদের ক্লাবের সমর্থকের সংখ্যা কিছু কম নয়। তাঁরা সবাই ক্লাবের পাশে থাকবেন, এই ভরসা আমাদের আছে।

সবাইকে জানাই প্রতিষ্ঠা দিবসের আন্তরিক ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা।

সম্মানিত যাঁরা

ভারত গৌরব: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়	প্রাইড অফ বেঙ্গল: মহম্মদ সামি	বর্ষসেরা ফুটবলার: নন্দকুমার সেকার
পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় মেমোরিয়াল সম্মান: কার্লোস কুয়াদ্রাত	জীবনকৃতী সম্মান: রঞ্জিত মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ষসেরা ক্রিকেটার: সাত্যকি দত্ত
উদীয়মান খেলোয়াড়: প্রভসুখন সিং গিল	সেরা সাংবাদিক: রাজদীপ সরদেশাই, সরোজ চক্রবর্তী	
সেরা রেফারি: সুকৃতি কুমার দত্ত, জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়	দ্য মেকার অফ আ চ্যাম্পিয়ন: ইমরান আজিজ মির্জা	

সেরা সমর্থক: মুকুল গঙ্গোপাধ্যায়, গণেশ দাস

গুরু পিকের সঙ্গে সুভাষ ভৌমিক, সুরজিৎ সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা ও মহম্মদ হাবিব

'বেঁচে থাকতে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে বিক্রি হতে দেবো না'

লাল হলুদ মানেই তিনি। ক্লাবের শীর্ষ কর্তা দেবব্রত সরকারের মুখোমুখি অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রশ্ন: প্রায় চার দশকেরও বেশি সময় ধরে আপনি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে জড়িয়ে। শুরুটা কী ভাবে?

দেবব্রত সরকার (নীতু): ষাটের দশকের শেষদিকে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখেছি আমি। তখন একেবারেই কিশোর বয়স। । এই মাঠে এলেই শান্তি পেতাম। খেলা দেখা দিয়ে শুরু। তারপরে পল্টুদা (দাস) এবং জীবনদার (চক্রবর্তী) ভালোবাসায় পড়ে গেলাম। দারুণ লাগত ওঁদের। একবারে লড়াকু মেজাজ। প্রথম কাছাকাছি এসেছিলাম ক্লাবের একটা নির্বাচনকে ঘিরে। আস্তে-আস্তে ভরসা বাড়ল আমার উপরে। পল্টুদা হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন, আমাকে দিয়ে কাজ হবে।

প্রশ্ন: 'গুরু' পল্টুদাকে কাছ থেকে দেখে কী শিখলেন?

দেবব্রত: পল্টুদা আমাকে প্রথমদিনেই একটা স্পষ্ট কথা বলে দিয়েছিলেন। যা আজও মনে আছে আমার। বলেছিলেন, 'ক্লাবে যখন ঢুকবে, তখন বাইরে একটা অদৃশ্য ট্রাঙ্ক রেখে ঢুকবে। সেই ট্রাঙ্কে তোমার যাবতীয় লজ্জা, যাবতীয় আবেগ-ভালোবাসা ঢুকিয়ে রেখে আসবে। জেনে রাখবে, ক্লাব থেকে বেরনোর সময় তোমাকে হতো তীব্র সমালোচনার মুখে পড়তে হবে। ঘৃণা সইতে হবে। গালাগালি সইতে হবে। এই সব যদি গায়ে মেখে ফেলো, তা হলেই তুমি শেষ।' পল্টুদার সেই সব কথা মনের মধ্যে গেঁথে রেখেছি। আর বলছিলেন, যত যাই হোক, ফুটবলারদের পাশে থাকবে। এটাই তো সবচেয়ে বড় শিক্ষা।

প্রশ্ন: ফুটবলাদের পাশে আপনি সব সময়ে থাকেন। এত বছরে কোন ফুটবলার বা কোচকে নিয়ন্ত্রণে রাখা আপনার পক্ষে সবচেয়ে কঠিন ছিল?

দেবব্রত: অবশ্যই সুভাষ ভৌমিক। আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আবার আমায় সবচেয়ে বেশি ঝামেলায় ফেলেছে। প্রদীপদাকেও আমি কোচ হিসেবে পেয়েছি। কিন্তু, প্রদীপদাকে একটা পর্যায়ের পরে নিয়ন্ত্রণে আনা যেত। ভোম্বলদাকে পারিনি। অদ্ভুত-অদ্ভুত আব্দার। না মেটালেই বাচ্চা ছেলের মতো রাগ। ক্লাব থেকে বেরিয়ে যেত। মানাতে জীবন বেরিয়ে যেত। পরে আবার বাচ্চা ছেলের মতোই মেনে নিত।

প্রশ্ন: যেমন? কোনও ঘটনা বলুন।

দেবব্রত: একটা মজার ঘটনা বলি, আশিয়ানের আগে আমি দীপক মণ্ডলকে নিয়ে গোয়া চলে গিয়েছিলাম। আলেমাও চার্চিলদের ডেরা থেকে মহেশ গাউলিকে তুলে এনেছিলাম। ঘটনা হল, এই পুরো বিষয়টা আমাদের কোচ সুভাষ ভৌমিক জানত না। প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল আমার উপরে। বলে দিয়েছিল, তোমার কত ক্ষমতা আমি দেখব। মহেশকে আমি কিছুতেই খেলাব না। তারপরে মহেশ প্র্যাক্টিসে নামল। প্রায় তিনঘণ্টার প্র্যাক্টিস শেষে প্রথম আমাকে এসে বলেছিল, 'শুধু এই বছর নয়, মহেশের সঙ্গে লম্বা চুক্তি করো। ওকে আমার চাই। আমায় সব ট্রফি এনে দেবে ছেলেটা। সকালে কী বলেছি, ভুলে যাও।' এই হচ্ছে ভোম্বলদা!

প্রশ্ন: দলবদলের বাজারে এত বছরে কাউকে নিতে না পারার আক্ষেপ?

দেবব্রত: মোহনবাগানের সত্যজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে আমি সই করাব বলে ক্লাবে নিয়ে চলে এসেছিলাম। কিন্তু ধরে রাখতে পারলাম না। মান্নাদা, শ্রদ্ধেয় শৈলেন মান্না বিষয়টিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। পল্টুদা আমায় বলেছিলেন, 'মান্নাদা ফোন করেছিলেন। তুমি সত্যজিৎকে ছেড়ে দাও। মান্নাদার কথা ফেলা সম্ভব নয়।' এরপরে আর কী করব!

প্রশ্ন: একটা সময়ে ক্লাব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এই অভিযোগও উঠেছিল।

দেবব্রত: একটা কথা শুনে রাখুন। যতদিন বেঁচে থাকব, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে বিক্রি হতে দেবো না। কেউ পারবে না। চেষ্টা হলেও রুখে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন অনেক গালিগালাজ হয়েছে। আজ দেখুন, কোনটা সত্যি। আর ধন্যবাদ দেব আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে। প্রবল ব্যস্ততার মধ্যেও তিনি আমাকে ফোন করে জানতে চেয়েছিলেন, ক্লাবের কী অবস্থা। পাশে দাঁড়িয়ে সব করেছেন। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

'দিদি একাই একশো', দেবব্রত সরকার সেই জার্সি তুলে দিচ্ছেন মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর হাতে

সময়-Special